স্বাধীন বাঙলাদেশ কেন

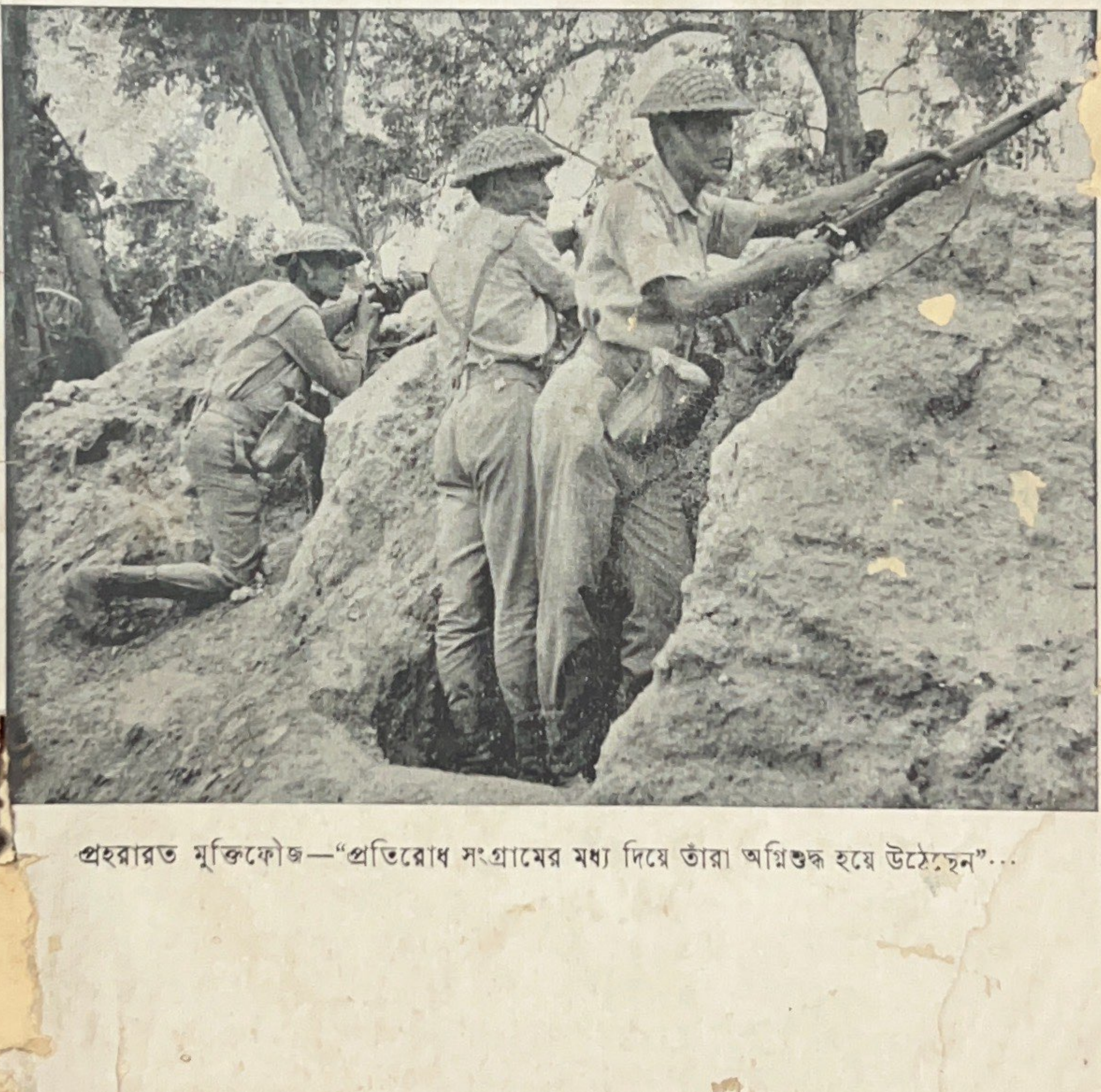

প্রহরারত মুক্তিফৌজ—"প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা অগ্নিশুদ্ধ হয়ে উঠেছেন"...

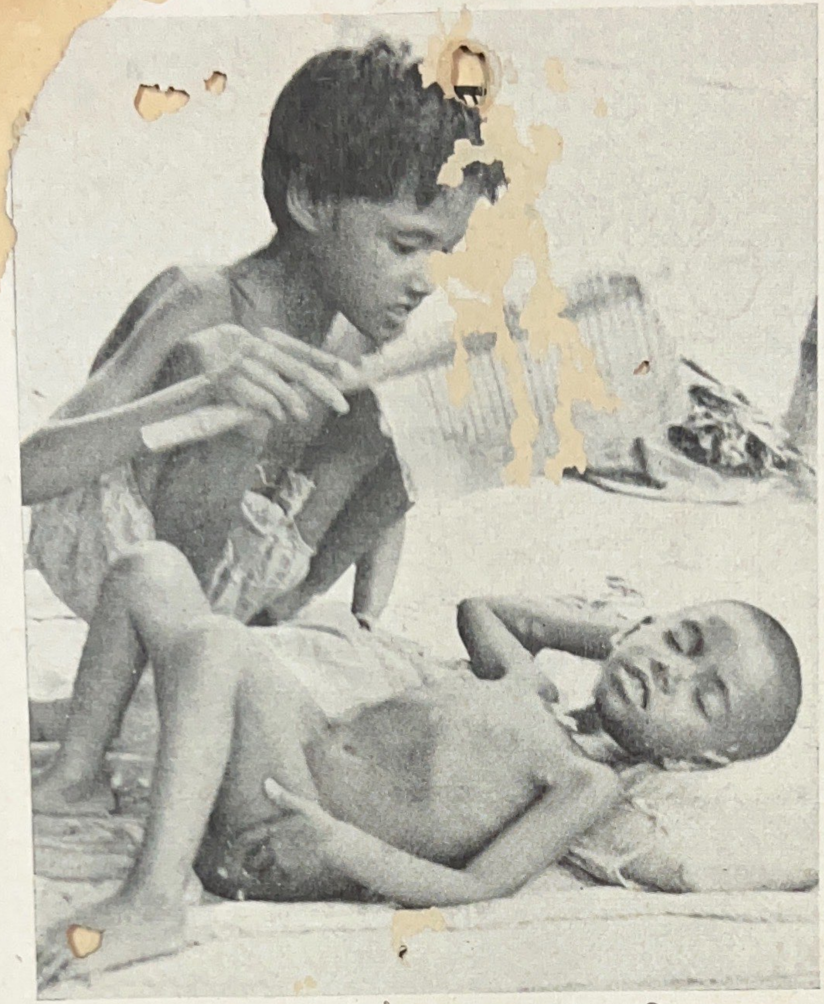

শরণার্থী এই দুটি অনাথ শিশুর ভবিষ্যৎ কী?

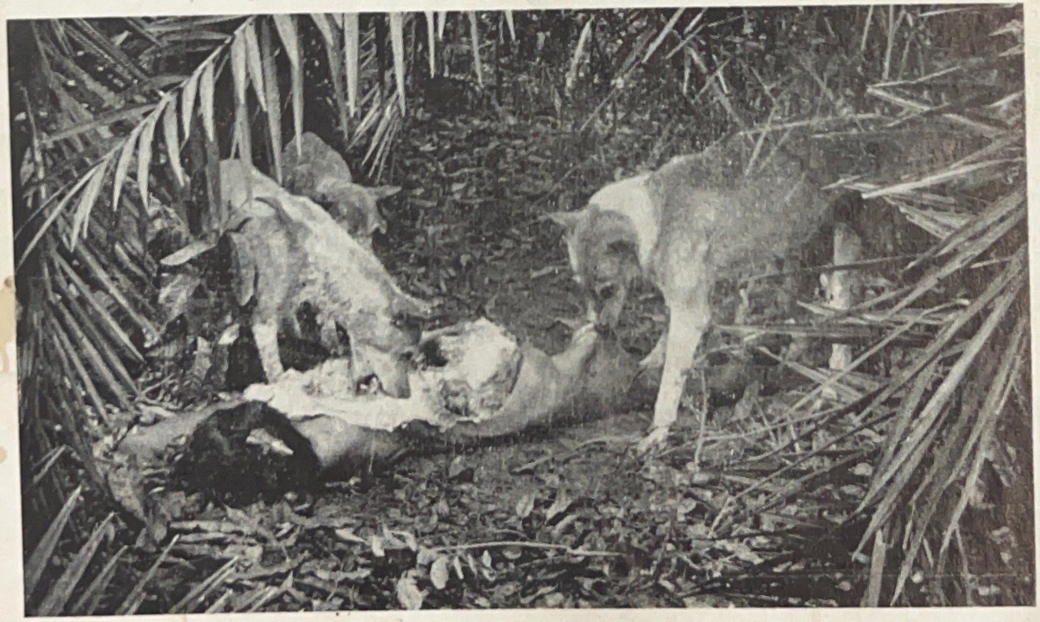

যশোহরের গৃহস্থবধূ জোহরা বিবি—"এই হত্যাকাণ্ড জাতি বিদ্বেষ ও মানবতার কণামাত্র বর্জিত ধর্ষকামপ্রসূত"…।

মুজাহিদুল ইসলাম সে.

স্বাধীন
বাঙলাদেশ কেন ?

মুজিবর রহমান । তাজুদ্দিন আহমদ । মৌলানা ভাসানী ।
আবদুল গফ্‌ফর খাঁ । গৌরী আয়ুব দত্ত ।
অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমেদ

বাঙলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বাঙলাদেশ কূটনৈতিক মিশন

বাঙলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রচার উপসমিতির (৩৪নং, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলি-১৩) পক্ষে শ্রীইন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীরণজিৎ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ এজ প্রিন্টার্স, ৫৯নং, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ত্রিশ পয়সা।

বাঙলাদেশ

—কাইফি আজমী

আমি একটা দেশ নই
যে তুমি আমাকে জ্বালিয়ে তছ্‌নছ করে দেবে
আমি একটা দেওয়াল নই
যে আমাকে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করবে
একটা সীমান্তরেখা,—আমি তা'ও নই
যে তুমি আমাকে মুছে ফেলে দেবে

দুনিয়ার পুরোনো একটা নক্সা
তুমি টেবিলে পেতে রেখেছ
এর মধ্যে কিছুই নেই
জটপাকানো কয়েকটা আঁকিবুঁকি ছাড়া
বৃথাই তুমি আমাকে সেখানে খুঁজে মরছো

আমি উদ্বুদ্ধ মানুষের আকাঙ্খা
নিপীড়িতদের মরণজয়ী স্বপ্ন
মানুষ যখন মানুষকে শুষে রক্তপান শুরু করে
লুণ্ঠতরাজ যখন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়
দমন-নির্যাতন যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গড়ায়
অদৃশ্য থেকে তখন যেন হঠাৎ আমি বেরিয়ে পড়ি
রক্ত-ঝরা হৃদয়ের ভেতর থেকে আমি জেগে উঠি

এর আগেও হয়তো তুমি আমাকে দেখেছ
কখনো পূবে, কখনো বা পশ্চিমে
শহরের সড়কে অথবা মেঠো-গাঁয়ে
মানুষজনের মধ্যে কখনো, আবার
এমনকি হয়তো বনে জঙ্গলে

আমার রয়েছে একটা ইতিহাস, আর
ইতিহাসই একমাত্র আমার
কিন্তু ভূগোল ?   না, মোটেই তা নেই
আমার ইতিহাস ঠিক পাখি-পড়া ক'রে
শেখানো যায় না
কিন্তু, মানুষ—তবু তারা গোপনেই
এই সব শিখে নেয়

কখনো কখনো আমি প্রবলভাবে জয়ী
কখনো কখনো বা নির্জিত
কখনো আমিই চড়াই কসাইদের শূলে
কখনো বা নিজেই হই ক্রুশবিদ্ধ
ফারাকটা শুধু এই—
আমাকে যারা মারে, নিজেদেরই তাদের মরতে হয়
আমি, না
আমার মৃত্যু নেই

তুমি কী বেয়াকুফ
পিষে ফেলতে চাও আমাকে ট্যাঙ্কের তলায়
ভিক্ষেয় যা জুটিয়েছো
আমার ওপর ফেলতে থাকো নাপাম বোমা, দিনে-রাতে,
এতে একমাত্র নিজেকেই তুমি ফুরিয়ে ফেলবে
আমার কোন্ হাতটা তুমি শেকলে বাঁধতে চাও ?
সাত কোটি হাত রয়েছে !
আমার কোন্ মাথাটা ধড় থেকে নামাতে চাও ?
রয়েছে সাত কোটি মাথা !

তর্জমা : সিদ্ধেশ্বর সেন

[কাইফি আজমী বিখ্যাত উর্দ্দু কবি। কিছুদিন আগে বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে সর্ব ভারতীয় মুশায়েরায় কবিতাটি আবৃত্তি করে যান। শোনার সুযোগ হয়েছিল। কবি সাজ্জাদ জাহীর ছিলেন সভাপতি ; আর মুশায়েরাটি ডাকা হয়েছিল বাঙলাদেশের সাহার্য্যার্থে।

সি. সে]

আমাদের বাঁচার দাবী

ছয় দফা কর্মসূচী

শেখ মুজিবুর রহমান

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশ্‌মনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনি ভাবে হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃ-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের, সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবাবিত ৬-দফা যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবি—অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ছয়-দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমীস্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার কাছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশ্‌মনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ইমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশ্‌মনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনাকরতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তি কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের

নিকট কায়েদে—আজম সহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুণই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইয়ে, এ সব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁৎকিয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামের শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইন সভাই ভাল, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে ফেডারেশন সরকারের একতিয়ারে

কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় ষ্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুণই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের একতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা সম্ভব নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাম পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ', বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেট্স্' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট্' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট্'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ 'স্টেট্' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অলটার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে:

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট্ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে।

ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এ প্রস্তাবে রাজী না হন, তবে শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের এইটুকু করিবেন না ?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে লিখিত ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজর্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই, তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ড-প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই

নক্শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ বা সংক্ষেপে ‘ঢাকা’ লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে পশ্চিম পাকিস্তান’ বা পংক্ষেপে ‘লাহোর’ লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শন স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্শার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের একতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চালিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বানিজ্য, ব্যাংকিং, ইনশিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট্ ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-সহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এই সব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ারমানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুক্না বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউব-ওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই

করণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। করণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে মিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাট-চাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্র ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪ নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এই ভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ত অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁদের

নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এ সব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নিবিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহলিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্র বিজ্ঞান স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস মুসলিম লীগ উভয়েই যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে,অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী পররাষ্ট্র-দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে আঞ্চলিক সরকার যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচার অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক

কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল্ ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের একতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি ঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের একতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের একতিয়ারে থাকিবে,

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফ্তানি চলিবে,

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফ্তানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলালেই দেখা যাইবে যে ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত

বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্বপাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফ্‌তানী করে, আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব-পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিষের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্‌তিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য ত দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট-চাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিষে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ায় আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রপ্তানিকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই।

ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফ্‌তানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬ নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয় নতুনও নয়। একুশ-দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তাহা করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই-পি-আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ-দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ সব কাজ সরকার কবে করিবেন

জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা সামরিক বাহিনী গঠন করিলেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে ঃ

এক, তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই, আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যত দিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, তত দিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্যে দাবী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুনে শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ বিজ্ঞানের কথা ঃ সরকারী আয় জনগণেয় ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের

আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই শশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহ্‌মত দিতেছেন সেই সব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল্‌ দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক্ পাওয়া। নিজের হক্ পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদর এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে সাথে আমাদের হক্‌টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্‌টাই চাই। আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না॥ আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে:

(১) প্রর্থম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী

ও দেশরক্ষার সদর দফ্তর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতা-বোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যা-গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তামের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্ণর হইতে চাহিতাম না। আপনাদের পি, আই, ডি, সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট্,

আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যান আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্সাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনি দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা, যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তনই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভায়েরা এই মাপ-কাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবী নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি তর্ক সহকারে দেখাইলাম আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব

পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছে, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হক্‌কে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়া ছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তার এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আসি মনে করিনা। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়া এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহর দরজায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

বিশ্ববাসীর প্রতি

তাজউদ্দিন আহমেদ

বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

বাঙলা দেশ যুদ্ধে লিপ্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন ছাড়া তার সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট বাঙলা দেশে তাদের গণহত্যার যুদ্ধকে ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে মরীয়া হয়ে ঘটনাকে বিকৃত করে দেখাবার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববাসীর কাছে খুলে বলা দরকার কোন অবস্থা দ্বারা তাড়িত হয়ে বাঙলা দেশের শান্তিকামী জনসাধারণ তাঁদের ন্যায়সংগত আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের জন্যে সংসদীয় রাজনীতি ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে।

ছয়-দফা কর্মসূচী

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শেষতম প্রয়াসে আওয়ামি লিগ পাকিস্তানের মধ্যে বাঙলা দেশের স্বায়ত্তশাসনের ছয়-দফা কর্মসূচীর উপস্থিত করেছিল আন্তরিকতার সঙ্গেই। ঐ ছয়-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে লড়ে আওয়ামি লিগ ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের বাঙলা দেশের জন্য নির্দিষ্ট ১৬৯টি মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের এই জয় এত চূড়ান্ত রকমের জয় ছিল যে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮০টি-ই তাঁরা পেয়েছেন। এই চূড়ান্ত জয় জাতীয় পরিষদেও তাদের দেয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

নির্বাচনোত্তর কাল ছিল আশার কাল। কেননা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও জনসাধারণ এত স্পষ্টভাষায় তাদের রায় ঘোষণা করে নি। পাকিস্তানের উভয় শাখাতেই ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এইরকম একটা ধারণা হয়েছিল যে ছয়-দফার ভিত্তিতে কাজ চলার উপযোগী একটি সংবিধান রচনা করা সম্ভব হবে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি সিন্ধু ও পাঞ্জাবে প্রধান দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে তারা ছয়-দফার প্রশ্নটি উত্থাপন করে নি। অতএব এর প্রতিরোধ করার জন্যও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তারা কোন দায়ে আবদ্ধ নয়। বেলুচিস্তানের প্রধান পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ন্যাপ) ছয়-দফার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও, প্রাদেশিক পরিষদের প্রধান দল 'ন্যাপ'ও সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের আদর্শে বিশ্বাসী। নির্বাচনের ফলাফলে, যাতে দেখা যায় প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি পরাজিত হয়েছে, তাই পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

রাজনৈতিক আলোচনা

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তুতিপর্বে আশা করা গিয়েছিল রাজনীতি-ক্ষেত্রের প্রধান দলগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা হবে। পরিষদ অধিবেশনের প্রস্তুতি হিসাবে আওয়ামি লিগ সর্বদাই প্রস্তুত ছিল অন্যান্য দলের কাছে নিজেদের সাংবিধানিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে এবং তাদের বিকল্প প্রস্তাব আলোচনা করতে। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গি দাবি করে গোপন আলোচনায় নয়, জাতীয় পরিষদেই সংবিধান নিয়ে বিতর্ক হবে এবং সেখানেই তা চূড়ান্ত রূপ পাবে। এই উদ্দেশ্যেই তারা জাতীয় পরিষদের আশু অধিবেশন দাবি করে আসছিল। আশু অধিবেশন হবে প্রত্যাশা করেই আওয়ামি লিগ দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে ছয়-দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করছিল এবং এই ধরনের একটি সংবিধান রূপায়ণের সমস্ত রকমের তাৎপর্য যথোচিত ভাবে বিবেচনা করে দেখছিল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জেনারেল ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এই অধিবেশনে জেনারেল ইয়াহিয়া নিজেদের কর্মসূচীর প্রতি আওয়ামি লিগের আনুগত্য কতটা তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন এবং তাদের

কাছে থেকে এই আশ্বাস পান যে এই কর্মসূচীর তাৎপর্য সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অবহিত। ইয়াহিয়া কিন্তু সংবিধান সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন না এবং এ সম্পর্কে সমস্ত প্রত্যাশা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া এইরকম একটা ধারণা দেন যে ছয়-দফার মধ্যে গুরুতর আপত্তি করার মতো তিনি কিছু খুঁজে পান নি, তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের পি পি পি'র সঙ্গে সমঝোতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

এর পরের দফায় আলোচনা চলে ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ থেকে ঢাকায়, পিপলস্ পার্টি ও আওয়ামি লিগের মধ্যে। সেখানে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিঃ ভুট্টো ও তাঁর সঙ্গীরা আওয়ামি লিগের সঙ্গে অনেকগুলি বৈঠক করেন।

ইয়াহিয়ার মত মিঃ ভুট্টোও শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আসেন নি। তিনি ও তাঁর উপদেষ্টারা প্রধানত আগ্রহী ছিলেন 'ছয়-দফা'-র তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনাতে। তাঁদের সাড়াটা যেহেতু রীতিমত নেতিবাচক ছিল এবং যেহেতু তাঁদের নিজস্ব কোন পূর্ব-প্রস্তুত বক্তব্য ছিল না, সেই জন্য এই সমস্ত কথাবার্তা এমন একটা গুরুত্বসম্পন্ন আলোচনায় পর্যবসিত হতে পারে নি যেখানে দু-পক্ষের মধ্যেকার ব্যবধান দূর করার কোন চেষ্টা করা যায়। এ কথাটা স্পষ্ট ছিল যে তখনও পর্যন্ত মিঃ ভুট্টোর এমন কোন আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল না যেখান থেকে আলোচনা শুরু করা যায়।

একথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার যে পিপলস্ পার্টি যখন ঢাকা পরিত্যাগ করে তখন তাদের তরফ থেকে এমন কোন ইঙ্গিত ছিল না যে আওয়ামি লিগের সঙ্গে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বরং তাঁরা বলেছিলেন যে সব দরজাই খোলা রইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে একদফা আলোচনার পর পিপলস্ পার্টি হয় আওয়ামি লিগের সঙ্গে দ্বিতীয় একদফা কার্যকর আলোচনা চালাবেন, না হয় জাতীয় পরিষদে মিলিত হবেন; সেখানকার কমিটিগুলিতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রচুর অবকাশ আছে।

জনসাধারণের ইচ্ছাকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র

মিঃ ভুট্টোর জাতীয় পরিষদ বয়কট করার কথাটি তাই একেবারে বিস্ময়কর রূপে এসেছে। বয়কটের সিদ্ধান্তটি বিস্ময়কর এই কারণে যে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই একবার মিঃ ভুট্টোর কথা মেনে নিয়েছেন ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে জাতীয়

পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য শেখ মুজিবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে এবং মিঃ ভুট্টোর ইচ্ছা অনুযায়ী ৩ মার্চ অধিবেশনের দিন ধার্য করে।

পরিষদ বয়কট করার সিদ্ধান্তের পরে মিঃ ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সমস্ত দলের বিরুদ্ধে ভীতি-প্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন, যাতে তাঁরা অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। প্রমাণ আছে যে এই কাজে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী লেফটেন্যান্ট জেনারেল উমর মিঃ ভুট্টোর হাত শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমাংশের বিভিন্ন নেতাদের উপর চাপ দেন পরিষদে যোগদান না করার জন্য। মিঃ ভুট্টো ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল উমরের এই চাপের কৌশল প্রদর্শন সত্ত্বেও, পিপলস পার্টিও কোয়াইয়ূমের মুসলিম লিগ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত জাতীয় পরিষদ সদস্য ৩ মার্চের অধিবেশনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে আসন সংরক্ষিত করেছিলেন।

কোয়াইয়ুম মুসলিম লিগের মধ্যেই তাদের অর্ধেক সদস্য তাঁদের আসন সংরক্ষিত করেছিলেন এবং পিপলস পার্টির মধ্যেও বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দেয়, তাদের অনেক সদস্যই ঢাকায় আসতে চান। বাঙলা দেশের বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত মোর্চা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া ১ মার্চ তারিখে অ্যাসেম্বলির অধিবেশন কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য নয়, অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে মিঃ ভুট্টোকে বাধিত করেন। উপরন্তু তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর অ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে বরখাস্ত করেন। তাঁকে মনে করা হত ইয়াহিয়ার প্রশাসন যন্ত্রে অন্যতম নরমপন্থী বলে। কিছু বাঙালিকে নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেটকেও বরখাস্ত করা হয়, যার ফলে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় পশ্চিমাঞ্চলের সামরিক জুণ্টার হাতে।

এই পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়ার এই কাজকে মিঃ ভুট্টোর সঙ্গে যোগসাজসে জনসাধারণের ইচ্ছাকে বানচাল করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু বলে গণ্য করা যায় না। জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র মঞ্চ, যেখানে বাঙলা দেশ তার কণ্ঠস্বর ও রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, আর তাকে বানচাল করা থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পার্লামেণ্টকে পাকিস্তানে ক্ষমতার প্রকৃত উৎস হতে দেওয়া হবে না।

অসহযোগ আন্দোলন

বাঙলা দেশে এই স্থগিত করার প্রতিক্রিয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সারা দেশ জুড়ে জনগণ এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জানাবার জন্য যখন পথে নেমেছিলেন তখন জনগণ নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারেন যে ইয়াহিয়া কখনোই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাননি, সংসদীয় রাজনীতিকে তিনি প্রহসনে পরিণত করছেন। জনসাধারণ বুঝতে পারেন যে বাঙলা দেশের অধিকার পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে কখনোই অর্জন করা যাবে না, যে পাকিস্তানে ইয়াহিয়া তার নিজের ফতোয়া অনুযায়ী আহূত পরিষদের অধিবেশনকে নির্লজ্জভাবে বানচাল করতে পারে। তাই তাঁরা দাবি করলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে যেতে হবে।

শেখ মুজিব অবশ্য রাজনৈতিক মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ৩ মার্চ তারিখে অসহযোগের এক কর্মসূচী অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে তিনি দখলদার ফৌজের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মোকাবিলার অস্ত্রটি বেছে নেন, তাদের সুবুদ্ধি উদয়ের উপায় হিসাবে। ২ ও ৩ মার্চ তারিখে নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালানোর ফলে এক হাজারেরও বেশি লোক হতাহত হয়েছিল। তার সামনে মুজিবুরের এই কাজটিই ছিল একটা বড় কাজ।

অসহযোগ আন্দোলনের ধারাটি এখন ইতিহাসের অঙ্গ। ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙলা দেশের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন যতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কোনো মুক্তি আন্দোলনে কখনো তা করা হয়নি। এই অসহযোগ ছিল সামগ্রিক। নতুন গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খাঁকে শপথ গ্রহণ করাবার জন্য হাইকোর্টের কোনো বিচারপতিকে পাওয়া যায়নি। পুলিস ও পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিস সহ সমগ্র অসামরিক প্রশাসন অফিসে যোগ দিতে অস্বীকার করে। জনগণ সেনাবাহিনীকে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করেন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের অসামরিক কর্মচারীরা পর্যন্ত এই বয়কটে যোগদান করেন।

অসহযোগ শুধু কাজে অনুপস্থিত থাকার মধ্যেই থেমে থাকেনি। অসামরিক প্রশাসন ও পুলিস শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাদের সমর্থন দানের অঙ্গীকার দেন এবং তাঁর নির্দেশাধীনে চলে আসেন।

এই অবস্থায়, আইনসম্মত সরকার না হওয়া সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে শাসন সংক্রান্ত ও অর্থ নৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে

আওয়ামী লিগ হাল ধরতে বাধ্য হয়েছিল। তারা তাতে শুধু জনগণের সমর্থন নয়, বেসামরিক শাসন সংক্রান্ত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁরা আওয়ামী লিগের নির্দেশবলী মেনে চলছিলেন এবং নিজেদের অসুবিধাগুলি মিটিয়ে নিচ্ছিলেন।

এই অদ্ভুত অবস্থায় শাসন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবার কথা ছিল আওয়মী লিগ তা কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর স্বেচ্ছাসেবকরা পুলিশের সহযোগিতায় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ভালভাবেই আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে কাজ দেখিয়েছিলেন।

সামরিক প্রস্তুতি

আওয়ামী লিগের প্রতি এই বিপুল জনসমর্থন ও তার ঐতিহাসিক সার্বিক অসহযোগ ইয়াহিয়াকে শঙ্কিত করেছিল। তিনি ৬ মার্চ সেই অবস্থায় একটি প্ররোচিত বক্তৃতায় পাকিস্তানের তৎকালীন অচলাবস্থার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করেন মুজিবুর রহমানকে এবং মূল সমস্যার হোতা ভুট্টোর নাম পর্যন্ত মুখে আনেন নি। এই বক্তৃতার পরে তিনি আশা করেছিলেন আওয়ামী লিগ ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। ফলে সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল এই ঘোষণাকে ধ্বংস করে দেবার জন্যে এবং সামরিক জুন্টার কড়া মনোভাবের প্রমাণ হিসেবে জেনারেল ইয়াকুবের স্থলে জেনারেল টিক্কা খানকে সামরিক শাসক করে পাঠানো হয়। অন্যদিকে মুজিবুর জনগণের স্বাধীনতার প্রতি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ খোলা রাখার জন্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না।

এখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জন্যে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না, বরং সময় নেওয়ার চাতুরি করে তাঁরা বাঙলা দেশে সৈন্যবাহিনীর শক্তি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছিলেন। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর গণহত্যাকে নরম করে দেখানোর পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১ মার্চের কিছু আগে যে ট্যাঙ্কগুলি উত্তরের রংপুর সীমান্ত রক্ষার কাজে পাঠানো হয়েছিল সেগুলি ঢাকায় ফেরৎ নিয়ে আসা হয়। অন্য দিকে সেনাবাহিনীর লোকদের ও পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠানোর ব্যাপারে প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়।

১ তারিখ থেকে ২৫শে মার্চ আলাপ আলোচনা পর্যন্তই সৈন্যরা ঢাকায় আসতে শুরু করে। পি আই-এর বেসামরিক বিমানে সিংহল হয়ে সাদা পোশাকে সৈন্যবাহিনী বন্যার মতন বাঙলা দেশে ঢুকতে শুরু করে। সি ১৩০ গুলি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকায় আসে। অনুমান করা হয় এই কয়দিনে এক ডিভিশনের মতন সৈন্য আমদানি করা হয়। বিমান বাহিনীর ঘাঁটির নিরাপত্তার জন্যে ব্যবস্থা জোরদার করা হয়, চারপাশে মেশিনগান দিয়ে জালের মতন ঘিরে ফেলা হয় এবং যাবতীয় যাত্রীদের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। গুপ্তহত্যা ইত্যাদিতে শিক্ষিত এম এস জি কমাণ্ডোর একটি দলকে ঢাকা ও সৈদপুরের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্যে এবং বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে দাঙ্গা বাধানোর জন্যে আগে থেকেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক মীমাংসা

ছলচাতুরির এই কৌশলের অঙ্গ হিসাবে মুজিবের সঙ্গে আলোচনার সময়ে ইয়াহিয়া একটা আপসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেন। ১৬ মার্চ থেকে যে আলোচনা শুরু হয় তাতে তিনি পুরনো সবকিছুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য তাঁর ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ করেন। একটি সঙ্কটজনক সাক্ষাৎকারে মুজিবর তাঁকে আওয়ামি লিগের ৪ দফার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ৪ দফার ভূমিকাদেরই একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রে তাঁদের কোন বড় ধরনের আপত্তি নেই।

যে সমস্ত মূল বিষয় সম্পর্কে মতৈক্য হয়েছিল, সেগুলি হল ঃ

১। মার্শাল ল প্রত্যাহার এবং প্রেসেডেন্টের একটি ঘোষণার দ্বারা এক অসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে তাঁর হাতে।

৪। শাসনতন্ত্রকে চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য পরিষদের সম্মিলিত অধিবেশনের প্রস্তুতিরূপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের পৃথক বৈঠক।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টো এখন যে বিকৃত ভাষ্য প্রচার করছেন তার বিপরীতরূপে,

পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবটা এসেছিল ইয়াহিয়ার কাছ থেকেই। তিনি এই বাস্তব সুবিধার উল্লেখ করেন যে, ছয়-দফায় যদিও বাঙলা দেশ ও কেন্দ্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে একটা ব্লু-প্রিন্ট দেওয়া হয়েছে, তবু সেটা প্রয়োগ করতে গেলে পশ্চিমাঞ্চলে গুরুতর অসুবিধা দেখা দেবে। এই কারণে, পশ্চিমাঞ্চলে এম এন এ-দের ছয়-দফা শাসনতন্ত্র ও এক ইউনিট ভেঙে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কের একটা নতুন ধরন বার করার জন্য একত্রে মিলিত হতে দেওয়া দরকার।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে নীতিগতভাবে একবার এই মতৈক্য হবার পর একমাত্র প্রশ্ন ছিল মধ্যবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রের পাশাপাশি বাঙলা দেশের ক্ষমতা নির্ণয়ের প্রশ্ন। এক্ষেত্রেও সম্মিলিতভাবে ঠিক হয় যে ক্ষমতা বণ্টনের কাজটি হবে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত শাসনতন্ত্রের যথাসম্ভব কাছাকাছি। আশা করা হয় যে এই শাসনতন্ত্র হবে 'ছয় দফার' ভিত্তিতে।

মধ্যবর্তী বন্দোবস্তের এই অংশটি স্থির করার জন্য প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ এম এম আহমেদকে বিশেষভাবে আনা হয়। আওয়ামি লিগের উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় তিনি একথা পরিষ্কারভাবে বলেন যে রাজনৈতিক মতৈক্যে উপনীত হতে পারলে, এমন কি মধ্যবর্তী কালেও 'ছয় দফার' একটা ভাষ্য তৈরীর কাজটা কোনো অনতিক্রম্য সমস্যা নয়। আওয়ামি লিগের খসড়ায় তিনি যে তিনটি সংশোধনীয় চূড়ান্ত তালিকা উপস্থিত করেন তাঁর প্রস্তাব হিসেবে, তাতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে সরকার ও আওয়ামি লিগের অবস্থানের মধ্যেকার ব্যবধানটি আর নীতিগত ব্যাপার নয়, এখন এটা শুধু প্রস্তাবের ভাষাটি কী হবে সে সম্পর্কেই। ২৪ মার্চ তারিখের অধিবেশনে আওয়ামী লিগ ভাষাগত সামান্য কিছু পরিবর্তন সহ মধ্যে চূড়ান্ত একটি খসড়া প্রণয়নের অধিবেশন—যেখানে অন্তবর্তী শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে—অনুষ্ঠানে তখন আর কোনো বাধা দিল না।

একথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার যে কোনো স্তরেই আলোচনা ভেঙে পড়েনি অথবা জেনারেল ইয়াহিয়া বা তাঁর দল এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি যে তাঁদের এমন একটা চূড়ান্ত অবস্থান আছে যেটা পরিত্যাগ করা যাবে না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইনগত রক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নটি হল ইয়াহিয়ার নিছক আরেকটি বিলম্বিত উদ্ভাবন, যার উদ্দেশ্য হল তাঁর এই গণহত্যাকে চাপা

দেওয়া। তিনি ও তাঁর দল মেনে নিয়েছিলেন যে ১৯৪৭-এর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্টের পূর্ব দৃষ্টান্ত অনুযায়ী প্রেসিডেণ্টের ঘোষণার সাহায্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার কোনো আইনগত রক্ষা-ব্যবস্থা থাকবে না বলে পরবর্তীকালে মিঃ ভুট্টো যে ধারনাটি উপস্থিত করেছেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া যাকে অনুমোদন করছেন, সেই ধারনাটি শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে কখনোই বিবাদের বিষয় ছিল না। এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহও নেই যে ইয়াহিয়া যদি এমন ইঙ্গিত দিতেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অত্যাবশ্যক, তবে আওয়ামি লিগ এরকম একটা ছোট আইনগত সূক্ষ্ম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ভাঙত না। অন্ততঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে এরকম একটা অধিবেশনে তাদের ভয়ের কিছু ছিল না এবং পৃথক অধিবেশনের সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিয়েছিল মিঃ ভুট্টোর সঙ্গে মানিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে, পার্টির জন্য নেওয়া কোন মৌলিক অবস্থানের জন্য নয়।

বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে যে মতৈক্য হয়েছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় মিঃ ভুট্টোর ২৫ মার্চ তারিখের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। জেনারেল ইয়াহিয়া ও মিঃ ভুট্টোর মধ্যে পৃথক বৈঠক কী কী ঘটেছে তা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না, কিন্তু এমন সাক্ষ্য আছে যে আওয়ামি লিগের সঙ্গে আলোচনার গতি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত মিথ্যা পি পি পি-কে যোগানো হয়। তাদের বলা হয় যে শেখ মুজিব চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তিনি প্রত্যহ তাঁর দাবি বাড়িয়ে চলেছেন। বলাই বাহুল্য, আওয়ামি লিগের টীম ও ইয়াহিয়ার উপদেশটাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলিতে এই সমস্ত আশঙ্কার সামান্যতম ইঙ্গিতও দেওয়া হয়নি। সেখানে সৌহার্দ্য ও আশার ভাব শেষ পর্যন্ত ছিল।

অশুভ ইঙ্গিত

একদিকে যখন মীমাংসার আশা জাগিয়ে তোলা হচ্ছিল, অন্যদিকে তখন চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্রবাহী জাহাজে "এম ভি সোয়াটের" মাল খালাস করার আকস্মিক সিদ্ধান্ত থেকে সেনাবাহিনীর অভিসন্ধির অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি পূর্বে চট্টগ্রামস্থিত গ্যারিসনের অধিনায়ক বাঙালি অফিসার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে হঠাৎ তাঁর কমাণ্ড থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হয় একজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে। ২৪ তারিখ রাতে তাঁকে বিমানে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় সশস্ত্র প্রহরাধীনে,

এবং সম্ভবত তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। নতুন কম্যাণ্ডের অধীনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জাহাজ খালাস করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এটা করা হয় এই ঘটনা সত্ত্বেও যে বন্দর শ্রমিকদের অসহযোগের সামনে গত ১৭ দিন ধরে সেনাবাহিনী মাল খালাস থেকে বিরত ছিল। মাল খালাসের সিদ্ধান্তটা ছিল হিসাব করা একটা প্ররোচনা, যার ফলে ১ লক্ষ মানুষ চট্টগ্রামের পথে নেমে পড়েন এবং সেনাবাহিনী তাদের পথ করে নেবার জন্য ব্যাপকভাবে গুলি চালায়। আওয়ামি লিগ জেনারেল পীরজাদার কাছে প্রশ্নটি তোলে—যখন আলোচনা চলছে তখন এই বাড়াবাড়ি কেন ঘটতে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি জেনারেল ইয়াহিয়াকে জানানো হবে—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দানের অতিরিক্ত কোনো উত্তর তিনি দেন না।

আক্রমণ প্রতিরোধ

২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ও আওয়ামি লিগের উপদেষ্টাদের মধ্যে যে চূড়ান্ত অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে মিঃ এম এম আহমেদ তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, জেনারেল পীরজাদা সে ব্যাপারে একটি মূল অধিবেশনের জন্যে অপেক্ষা করার আবেদন জানান। এই প্রস্তাব ফলপ্রসূ হয়নি, বরং জানা যায় মিঃ এম এম আহমেদ, যিনি মিটমাট করার হোতা ছিলেন, তিনি নিজে আওয়ামি লিগের অজ্ঞাতসারেই **২৫ মার্চ সকালে হঠাৎ করাচি চলে যান**।

২৫ মার্চ সকাল ১১টার মধ্যেই সৈন্যবাহিনী সহরে 'পজিশন' নিতে সুরু করে। ইতিহাসের তুলনাবিহীন পরিকল্পিত গণহত্যাটি ২৫ মার্চের মধ্য রাত্রি থেকেই ঢাকার জনবহুল অঞ্চলগুলির ওপর আক্রমণ করা থেকে শুরু হয়ে যায়। কোন সতর্কতা দেওয়া হয়নি, কোন কারফিউ পর্যন্ত জারী করা হয়নি, শুধু অতর্কিতে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী মেসিনগান, ট্যাঙ্ক এবং কামান ইত্যাদি নিয়ে মৃত্যু ও ধ্বংসের লীলা শুরু করে দেয়। ৫০ হাজার মানুষ, তাদের মধ্যে অধিকাংশ নারী ও শিশু নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা হবার পর ২৬ মার্চ সকালে জেনারেল টিক্কা খান প্রথম সামরিক আদেশ জারী করেন।

ঢাকা একটা নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে, শহরের চারদিকে আগুন জ্বলছে। মিলিটারির লাগানো আগুন থেকে বাঁচতে ঘুমন্ত অধিবাসীরা বাইরে এলে তাদের উপর চালান হয় মেশিনগান।

পুলিশ, ই পি আর এবং সশস্ত্র ভলান্টিয়ারেরা বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিন্তু পাক বর্বরতার শিকার হন দুর্বল, নিরীহ, নিঃসন্দিগ্ধ মানুষেরা—তাদের হাজারে হাজারে এলোপাথাড়িভাবে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের আদেশে পাক সেনাবাহিনী যে গণহত্যা করেছে তার বিশদ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমরা সংকলন করছি। আমরা শীঘ্রই তা প্রকাশ করব। তাদের এই অভিযানের ব্যাপকতা ও বর্বরতা সভ্যজগতের সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

বাঙালীদের উপর গণহত্যা চালাবার প্রকাশ্য অনুমতি দিয়ে সেনাবাহিনীকে অর্গলমুক্ত করে ইয়াহিয়া নিজে ২৫ মার্চ রাত্রে ঢাকা ত্যাগ করেন। পরেরদিন রাত্রি ৮টার আগে এই বর্বরতার তাঁর নিজস্ব কৈফিয়ৎ জানা যায় নি। ঐ সময় বিশ্ববাসীকে এই নরমেধের হেতু প্রথম জানান হয়। বিবৃতিটি অসংগতিতে ভরা, মিথ্যা দিয়ে বোনা। যে দলের সঙ্গে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন সেই দলকে দেশদ্রোহী ও আইন অমান্যকারী অ্যাখ্যায় অভিহিত করা বাঙলা দেশের পরিস্থিতি বা আলোচনার গতির সঙ্গে কোনক্রমেই সংগতিপূর্ণ নয়। বাঙলা দেশের একমাত্র প্রতিনিধি এবং জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অধিকারী আওয়ামি লিগকে বেআইনি ঘোষণা করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনভাবে ব্যক্ত অভিমতকে বিদ্রূপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিবৃতির স্থূলতাই স্পষ্ট প্রমাণ যে ইয়াহিয়া এখন আর যুক্তি বা নৈতিকতার আড়ালে আশ্রয় নিতে আগ্রহী নন, বাঙলা দেশের মানুষকে পিষে মারবার জন্য এখন তিনি জঙ্গলের আইনের আশ্রয় নিয়েছেন।

ইয়াহিয়া চক্র পাকিস্তানের কবর খুঁড়েছেন

পাকিস্তান আজ মৃত, শবের পাহাড়ের নিচে সমাহিত। বাঙলা দেশে সৈন্যদের হাতে শত সহস্র নিহত মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনার করেছে। পরিকল্পিত গণহত্যার আশ্রয় নেবার সময় ইয়াহিয়া নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তিনি পাকিস্তানের কবর খুঁড়ছেন। তাঁর আদেশে তাঁর লাইসেন্স-প্রাপ্ত ঘাতকেরা পরবর্তী সময়ে যে হত্যালীলা সংঘটিত করেছে তা কোন জাতীর ঐক্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নয়। এই হত্যাকাণ্ড জাতিবিদ্বেষ ও মানবতার কণামাত্র বর্জিত ধর্ষকামপ্রসূত। পেশাদার সৈন্যরা

আদেশ পেয়ে সামরিক আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছে, তাদের দেখা গেছে এমন এক হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা সংগঠিত করতে সভ্যতার ইতিহাসে যা তুলনারহিত। এইসব ঘটনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে দুই দেশের ধারণা ইতিপূর্বে ইয়াহিয়া এবং তাঁর অনুচরদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে, নাহলে নিজ দেশের জনসাধারণের উপর এ ধরণের নির্যাতন চালাতে তিনি সাহসী হতেন না।

ইয়াহিয়ার গণহত্যা তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যবর্জিত। একে বলা যেতে পারে পাকিস্তানের দুঃখজনক ইতিহাসের শেষতম অধ্যায়, বাঙলা দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে যা লিখতে মনস্থ করেছেন ইয়াহিয়া। এর লক্ষ্য হচ্ছে তাঁর সেনাবাহিনী বিতাড়িত বা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত গণ-হত্যা ও পোড়ামাটি নীতি চালিয়ে যাওয়া। এই সময়ের মধ্যে তিনি আশা করেন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবীসমাজ, প্রশাসকগণকে নির্মূল করতে পারবেন, আমাদের শ্রমশিল্প ও জনকল্যাণ ব্যবস্থাসমূহ ধ্বংস করে দিতে পারবেন এবং পারবেন আমাদের শহরগুলিকে ধূলায় মিশিয়ে দিতে। তাঁর দখলদার বাহিনী ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। পাকিস্তানের বিদায় বেলার উপহার হিসাবে তারা বাঙলা দেশের অগ্রগতিকে ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়ে যাবেন, যদিও নিজেদের স্বার্থে বিগত ২৩ বছর ধরে এ দেশকে যাঁরা শোষণ করেছেন।

বেলসেন ও অসউইজের পর এই বৃহত্তম গণহত্যার ঘটনাটিকে যেসব বৃহৎ শক্তি উপেক্ষা করতে চান তাঁদের পক্ষে এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন তাঁরা পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করবেন তাহলে তাঁরা সে কথা ভুলে যেতে পারেন, কেন না ইয়াহিয়ার নিজেরই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন মোহ নেই।

স্বাধীন বাঙলা একটি বাস্তব সত্য

তাঁদের বোঝা দরকার পাকিস্তান নিহত হয়েছে এবং তাকে হত্যা করেছে ইয়াহিয়া—স্বাধীন বাঙলা একটা বাস্তব সত্য, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অপরাজেয় মনোবল তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নবোদিত জাতিসত্তাকে নিজেদের রক্ত সিঞ্চন করে তাঁরা লালন করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে এই নতুন জাতিকে অস্বীকার করতে পারে। শীঘ্রই হোক আর

বিলম্বেই হোক ছোট বড় সমস্ত শক্তিকেই এই জাতিকে বিশ্বভ্রাতৃত্বে গ্রহণ করতে হবে।

তাই রাজনীতির স্বার্থে যেমন, মানবতার স্বার্থেও তেমন বৃহৎ শক্তিগুলির কর্তব্য ইয়াহিয়ার উপর পুরোদস্তুর চাপ সৃষ্টি করা যাতে তিনি যেন তাঁর ঘাতকদের খাঁচায় ভর্তি করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমাদের এই সংগ্রামে যাঁরা ইতিমধ্যেই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। একই কারণে সোভিয়েত এবং ভারতবাসীর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আমরা চীন, আমেরিকা, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন আফ্রো-এশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশ এবং অন্যান্য স্বাধীনতা প্রিয় দেশগুলিরও সমর্থন কামনা করি। প্রত্যেকটি দেশের উচিত তার নিজের মত করে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা। তারা যদি সেই ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন তাহলে বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া আর একদিনও আক্রমনাত্মক যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হবে না।

জনসংখ্যায় বাংলা দেশ হবে বিশ্বের অষ্টম দেশ। ইয়াহিয়ার দখলদার সেনাবাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন এবং উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি লাভের পর সেই ভস্মাবশেষের উপর নতুন জাতি গড়ে তোলাই বাঙলা দেশের একমাত্র লক্ষ্য। অনুন্নত এবং জনবহুল বাঙলা দেশের অর্থনীতি ইয়াহিয়া খাঁর বাহিনী ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কাজেই তার ভিতর দিয়ে দেশ গড়ে তোলার কাজটা খুবই কঠিন হবে। কিন্তু এখন আমরা একটা আদর্শের জন্য লড়াই করছি। দেশের নিরস্ত্র জনগণ আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে নিজেদের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা অগ্নিশুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা তাদের রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে কখনও ব্যর্থ হতে পারেন না।

আমরা আমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে ছোট বড় সকল জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা কোন জোট অথবা চুক্তিতে যোগ দিতে চাই না। যাঁরা সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন এবং ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষের কোন কামনা পোষণ করবেন না, তাঁদের কাছে আমরা সর্বপ্রকার সহায়তা কামনা করব।

আমরা আমাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সুদীর্ঘকাল ধরে লড়াই করছি। কাজেই কারও লেজুড় হাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমরা আবেদন করছি, আপনারা আমাদের স্বীকৃতি দিন এবং আমাদের জাতি গঠনের লড়াইয়ে নৈতিক এবং বৈষয়িক সাহায্য প্রদান করুন। সেই স্বীকৃতি এবং সাহায্য লাভে যতই বিলম্ব হবে, ততই হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং বাঙলা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

বিশ্বের দরবারে এটাই আজ বাঙলা দেশের একমাত্র বক্তব্য। বহু ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে বাঙলা দেশ আজ স্বীকৃতি লাভের অধিকার অর্জন করেছে। বিশ্বের জাতিসভায় বাঙলা দেশের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জনগণ ত্যাগে ব্রতী হয়ে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

মৌলানা ভাসানীর আবেদন

বাঙ্গালী বহু ত্যাগ বহু রক্ত দিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস তাহার বিনিময়ে কিছুই পায় নাই এই বার শেষ পরীক্ষা।

মো: আবদুল হামিদ ভাসানী

২৫।৬।৭১

সপ্তাহ-র প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে মৌলানা ভাসানী এই বাণীটি লিখে দেন।

গত ২৩ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদিগের নির্মম শোষণ ও শাসনে পূর্ববাঙলা আজ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল নিরবছিন্ন এই ধরনের হৃদয়হীন শোষণ, অবিচার ও অনাচার কি করিয়া সম্ভব হইল? স্থানীয় খুঁটিদার ও সাহায্যকারী সাক্ষাৎ না থাকিলে বাহিরের ডাকাত আসিয়া অজানা-ভাবে এমন নিপুণতার সহিত লুণ্ঠন করিতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তবাদী প্রভু, লোলুপ পুঁজিপতি, স্বেচ্ছাচারী সামরিক দানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাগণ পূর্বপাকিস্তানে তাহাদের জঘন্য শোষণের উচ্ছিষ্টভোগী একশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ও দালাল সৃষ্টি করিয়াই পাকিস্তানের জনসংখ্যার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদিগের সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে এবং তাহাদের উলঙ্গ শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলিম লীগ, জামাতে ইস্‌লামী, নেজামে ইস্‌লাম প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির পূর্বপাকিস্তানী দালালেরা ধর্ম, সংহতি, ইস্‌লাম বিপন্ন, কাশ্মীর গেল ইত্যাদির বাহানায় তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুদিগের সহিত এক কণ্ঠে শ্লোগান তুলিয়া বাঙলার বুকের উপর বসিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদিগকে বাঙলার

বুকের রক্ত শুষিয়া লইতে সুযোগ করিয়া দিয়াছে এবং নিজেরাও কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট পাইয়াছে। ১৯৫২, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালে পূর্ববাঙলার সংগ্রামী জনসাধারণ এই দালালদিগকে বার বার উচ্ছেদ করিয়া দিলেও সমূলে বিনাশ করিতে পারে নাই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দালালেরা সুচতুর চাতুরী দ্বারা বার বার পূর্ববাঙলার জনসাধারণের সর্বনাশ সাধন করিতে সফল হইয়াছে। এই সকল দালালরা পূর্ববাঙলার জনতার রুদ্ররোষে জনতার হাতে মার খাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে বা ভেক্ পাল্টাইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া বর্ণচোরারা স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে পূর্ববাঙলায় টেক্কা-এহিয়ার নরপশু সৈনিকদিগের ছত্রছায়ায় এই দালালেরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন টালবাহানায় পূর্ববাঙলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থায়ী শোষণদাসে পরিণত করিতে সুচতুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। অথচ আপনারা অবগত আছেন এই মিরজাফরেরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর গণ ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে নিজেদের চামড়া বাঁচাইবার জন্য পূর্ব বাঙলার এই ঐতিহাসিক, সংগ্রামের প্রতি জোর গলায় সমর্থন জানাইয়াছিল। এখন যখন টেক্কা-এহিয়ার অভিশপ্ত দানবদিগের হাত পূর্ববাঙলার নারী শিশু বৃদ্ধ অসহায় নিরাপরাধ মানুষের তাজা খুনে রঞ্জিত, যখন পাকিস্তানের নকল হিটলাররা ব্যাপক গণহত্যা বাদেও পূর্ববাঙলার মানুষের ঘরবাড়ি স্কুল কলেজ জ্বালাইয়া দিতেছে, এমন কি মসজিদ মন্দির কলুষিত করিতেছে, নারীদিগকে ধর্ষণ ও তৎপর খুন করিতেছে তখন এই সকল মুখচেনা দালালেরা ধর্ম, ইস্‌লাম, সংহতি ও ভারতবিরোধী প্রচারণায় সংগ্রামকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী নরপিশাচ দিগের তাঁবেদার বলিয়া তাহাদিগকে মদত যোগাইয়া বাঙালীদিগের স্থায়ী সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

১৯৬৭ সালে আরব ইহুদী যুদ্ধের পর ইহুদীগণ দখলকৃত আরব এলাকা হইতে আরবী মুসলমানদিগকে জর্ডানে পাঠাইয়া দিয়াছে, জানে মারে নাই। ইহুদীদিগের নিকট মুসলমানদিগের জীবনের যেটুকু মূল্য আছে পাঞ্জাবী মুসলমানদের কাছে বাঙালী মুসলমানদের জীবনের ততটুকু মূল্যও নাই। পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক ব্যাপক গণহত্যা তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস রকেয়াহলের অসংখ্য মুসলমান ছাত্রীদিগকে উলঙ্গ

করিয়া তাহাদিগের সতীত্ব নাশ করিয়াছে এবং পরে গুলি করিয়া ও বেওনেট দিয়া খোঁচাইয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ নারী ধর্ষণ ও হত্যা পূব বাঙলার প্রায় প্রতিটি শহর বন্দর ও গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা মসজিদে নামাজরত মুসলিমদিগকে হত্যা করিয়াছে ও মসজিদ জ্বালাইয়া দিয়াছে।

মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা লাখ লাখ নিরপরাধ মুসলমান শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে পাইকারিভাবে হত্যা করিতে সামান্যতম কুণ্ঠাও বোধ করে নাই।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব বাঙলার লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন মারা গিয়াছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন মানুষই কোন প্রকার সাহায্য কিংবা দুর্গত এলাকা সফর তো দূরের কথা সামান্যতন সহানুভূতিও জানায় নাই। এহিয়াখানের মুসলমানী শাসনে ঘূর্ণিবাত্যায় নিহত ৩ লক্ষ মুসলমানের যথা বিহিত দাফন কাফন ও কবর দেয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এহিয়া-টেক্কার বর্বর সৈনিকরা পূর্ব বাঙলার যে সকল লক্ষ লক্ষ মুসলমানদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিতেছে তাহাদিগকে যথাবিহিত দাফন-কাফন জানাজা ও কবর দিবার ব্যবস্থা করিতেছে না। এই সকল নরপশুরা যাহাদিগকে হত্যা করিতেছে তাহাদিগকে দিয়াই পূর্বে কবর খোঁড়াইয়া লইতেছে।

প্রতিটি মুসলমান জীবন শেষে কামনা করে তাহার মৃত্যুর পর যেন ধর্মীয় বিধানানুযায়ী তাহার সঠিক দাফন, কাফন, জানাজা ও কবর হয়। এহিয়া-টেক্কার বর্বর সৈনিকদের পৈশাচিক লীলায় লাখ লাখ মৃত মুসলমানের আত্মা সঠিকভাবে দাফন, কাফন, জানাজা ও কবর না পাইয়া আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করিতেছে।

মুসলমান হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানী ঐ সকল মুসলমানরা পূর্ববাঙলার মুসলমান কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষদিগের ধনসম্পদ, ধর্ম, সংহতি ও ইসলামের ছলনায় হরণ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে হাড়ে-মাংসে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সোনার বাংলাকে চিরদুর্ভিক্ষ বন্যা মহামারীর দেশে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

মুসলমান হইয়া পূর্ব পাকিস্তান নামক দেশের এ অংশে তাহারা প্রয়োজনীয় কলকারখানা গড়ে নাই, কৃষির উন্নতি করে নাই, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে

নাই, পূর্ব বাঙলার লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নাই, চাকুরি ও ব্যবসাতে পূর্ব বাঙলাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে, মিলিটারিতে পূর্ব বাঙলার লোক নেয় নাই, প্রভৃতি বহুভাবে পূর্ববাঙলাকে ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

অথচ পূর্ব বাঙলার এই সকল বিশ্বাসঘাতক দালালেরা কোনদিনই তাহার সামান্যতম প্রতিবাদ করে নাই। বরং এই নির্মম শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, ধ্বংসলীলা গণহত্যায় ইহারা সক্রিয় অংশীদার হইয়াছে। আজ তাহারা সুযোগ বুঝিয়া আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব বাঙলার ধ্বংসস্তুপের উপরে দাঁড়াইয়া আবার নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ২৩ বৎসরের সেই ঘুণে ধরা, ধ্বসে পড়া শ্লোগান ধর্ম, সংহতি, ইসলাম ও ভারতীয় বিদ্বেষের নামে তাহাদের পূব-পশ্চিম পাকিস্তানী দানবদিগকে নানাভাবে মদত যোগাইতেছে। তাহারা পূর্ব-বাঙলার সংগ্রামী জনসাধারণের মনোবল ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতেছে। জনতার সুদৃঢ় একতায় ফাটল ধরাইতে চেষ্টা করিতেছে। মুক্তিসংগ্রামীদিগকে ধরাইয়া দিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও অবাঙালীদিগের সাথে হাত মিলাইয়া বাঙালী হইয়া বাঙালীদিগের বাড়ী ঘরে লুটপাট ও আগুন জ্বালাইবার সহযোগিতা করিতেছে।

গত মহাযুদ্ধের পর আমি ইউরোপ ভ্রমণের পর পৃথিবীর কুখ্যাত অত্যাচারী ফ্যাসিস্ত হিটলারের শক্তিমত্তা ও তাহার অত্যাচারের বীভৎসা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়াছি এবং ভাবিয়াছি এই সমর দানব হিটলার এত ব্যাপক সৈন্য-সামন্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কি করিয়া পরাজিত হইল? পরে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি, হিটলারের চরম বর্বরোচিত অত্যাচারে কোন ক্রমে না ঘাবড়াইয়া ইউরোপের প্রতিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রশংসনীয় মনোবলই হইতেছে হিটলার মুসোলিনীর মতো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের মূলমন্ত্র। পাকিস্তানের ক্ষুদে হিটলার-মুসোলিনি, এহিয়া-টেক্কার অত্যাচার, অবিচার, গণহত্যা হইতে বাঁচিবার আমাদিগের সর্বপ্রধান অস্ত্র হইতেছে সুদৃঢ় মনোবল। অত্যাচারী কোনদিনই স্থায়ী জয়লাভ করিতে পারে না।

পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে সকল যুগের সকল বর্বর

অত্যাচারীই ধ্বংস হইয়াছে আদর্শে বলীয়ান সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী জনগণের বিরোধিতায়। ফেরাউন, এজিদ হালাকু খাঁ, হিটলার, মুসোলিনির মতো অত্যাচারীর পতনই আমাদের সম্মুখে প্রমাণ তুলিয়া ধরে যে পূর্ব বাঙলার অগণিত জনতা অস্ত্র ধরার সাথে সাথে তাহাদের অটুট মনোবল টিকাইয়া রাখিতে পারিলেই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। দেশবাসী সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আমার আবেদন কোন অবস্থাতেই ঘাবড়াইবেন না, মনোবল হারাইবেন না। অটুট মনোবলই সব অস্ত্রের বড় অস্ত্র।

এমতাবস্থার পূর্ব বাঙলার কৃষক, শ্রমিক, কামার, তাঁতী, জেলে, ছাত্র, জনতা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও চাকুরীজীবিদিগের নিকট আমার আকুল আবেদন—

(১) আপনারা বিশ্বাসঘাতক এই সকল দালালদিগের কোন প্রচারণাতেই কান দিয়া নিজেদের মনোবল ও একতা নষ্ট করিবেন না।

(২) পূর্ব বাঙলার ৪ হাজার ইউনিয়নে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়িয়া তুলুন।

(৩) প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সেণ্টার খুলুন। গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিন্।

(৪) মুক্তিফৌজদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

(৫) জানমান ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য যাহারা হিজরত করিতে বাধ্য হইতেছে দালালদের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

(৬) চাউল ডাইল খড়ি নূন তৈল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য অথবা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য দিয়া মুক্তিফৌজদিগকে সাহায্য করুন।

(৭) সকল শ্রেণীর যুবকেরা মুক্তিফৌজে যোগ দিউন।

(৮) দালাল ও শত্রুর প্রতি কড়া নজর রাখুন।

(৯) দালালদিগকে সামাজিক বয়কট করুন এবং তাহাদিগের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

(১০) সমর-দানব এহিয়া টেক্কার নির্মম অত্যাচারে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে অথচ জীবনের অন্তিম বাসনা অনুযায়ী কাফন-দাফন জানাজা ও কবরের মাটি পায় নাই সে সকল হতভাগা মানুষের এবং গত ঘূর্ণিবাত্যায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানাজা ও কবর হয় নাই মসজিদে মসজিদে জমায়েত হইয়া

তাহাদিগের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গায়েরানি জানাজার নামাজ আদায় করুন।

(১১) গ্রামে গ্রামে আবালবৃদ্ধ বনিতা শপথ গ্রহণ করুন যত রক্ত দিতে হয় দব কিন্তু শোষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত পূর্ব বাঙাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িব।

(১২) দলমত ভুলিয়া গিয়া সর্বদলীয় ঐক্য মোর্চা গড়িয়া তুলুন।

প্রত্যেক দেশেই যুবকেরাই মুক্তির জন্য জীবনধনমান রক্ত দিয়া অসীম ত্যাগ করিয়া থাকেন। পূর্ব বাঙলার সেই সংগ্রামী যুবশক্তির কাছে ও দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, যে জনযুদ্ধ শুরু হইয়াছে তাহা শুধু বাঙালী জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম নহে। তাহা পশ্চিম পাকিস্তানী কুটিল সামন্ত প্রভু, শোষক শিল্পপতি, অত্যাচাচী সমর দানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাদিগের শোষণ অত্যাচার অবিচার হইতে নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক জেলে তাঁতী প্রভৃতি শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামও বটে। অতএব গত ২৩ বৎসরের শোষণ শাসনের ফলে বাঙালীদিগের সর্বশ্রেণীর মানুষের যে চরম দুর্দশা দেখা দিয়াছে এইবার ধ্বংস না করিয়া পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠির পৈশাচিক কবল হইতে মুক্তি না পাইলে বাঙালীদিগের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই প্রতিজ্ঞা করুন যত রক্ত, যত জীবন যত কোরবানী করিতে হয় করিব, যুদ্ধ যত কঠিন যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, হউক। সব কিছুর বিনিময়ে শোষণমুক্ত সার্বভৌম স্বাধীন বাঙলাদেশ গড়িয়া তুলিব। এই মহান সংগ্রামে আল্লাহ আমাদিগের সহায় হইবেন।

*ছাত্রদিগের ও লেখাপড়া জানা জনসাধারণের নিকট আমার আবেদন এই বিবৃতিটি কার্বনে লিখিয়া কিংবা সাইক্লোস্টাইলে কপি করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দুই বাংলা

গৌরী আইয়ুব

বাংলা দেশ নিয়ে এই মাতামাতি, মুজিবর রহমানকে নিয়ে এই উচ্ছ্বাস পশ্চিম বাংলার অনেক মুসলমান পছন্দ করছেন না। এই নিয়ে বহু প্রশ্ন, কিছু বিদ্রূপ কিছু বা হতাশা মিশ্রিত মন্তব্য শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষে এটা বোঝা কি খুব কঠিন যে পাকিস্তান ধসে পড়ার অর্থ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে এক হতে পারে না? এই উপমহাদেশে রাজাগোপালাচারী কিংবা জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো গুটি দুই চার মানুষ ছাড়া আর প্রায় কোনো হিন্দুই পাকিস্তানকে মনে মনে মেনে নেননি। ফলে আজ যখন পাকিস্তানের বুনিয়াদ টলে উঠেছে তখন মুখ্যত সেই কারণেই হিন্দুরা খুশি এ কথা গোপন করে লাভ নেই। তবু বাঙলা দেশের একটা বিরাট জনসংখ্যা আরও একটি কারণে খুশি : পূর্ব বাংলার বাঙালী মুসলমান ফিরেছে আজ মায়ের ডাকে। একদিন যে বাঙালী মুসলমান বলতেন ‘হিন্দুর সাহিত্যে আমাদের স্থান নেই’ সেই মুসলমানই আজ হিন্দুর লেখা গান গেয়ে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করছেন বাঙালীত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার আশায়। এরপর এই বাংলার অধিকাংশ হিন্দুরও হৃদয়ে টান পড়বে এতো বলাবাহুল্য।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার মুসলমানের প্রতিক্রিয়া ঠিক এক একই রকম না হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। যে সব মুসলমান দেশ ভাগ হবার পরও নানা কারণে এদিকেই থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মনে পাকিস্তান সম্বন্ধে একটা দরদ, একটা প্রত্যাশা স্বভাবতই ছিল যা কোনো হিন্দুর মনে থাকা

সম্ভব নয়। এখানে আবার একটা দাঙ্গা বাধলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সেখানেই চলে যেতে হবে। এখানে চাকরীর বাজারে যে তীব্র প্রতিযোগিতা তাতে ব্যর্থকাম হলে হয়ত ঢাকা চট্টগ্রাম কি খুলনার ছেলের একটা চাকরী মিলবে। এদিকে মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলেও ওদিকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় পাকিস্তান সম্বন্ধে কি করে এদিককার মুসলমানের মন বিরূপ হতে পারে? পশ্চিম বাংলার বহু মুসলমানের কাছে তাই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভরসা, একটা আশ্রয়ের মতো ছিল। অতএব পাকিস্তান ধসে পড়ছে দেখে এদিককার মুসলমান যে বিচলিত বিভ্রান্ত এমন কি ক্রুদ্ধও বোধ করতে পারেন। এটা প্রত্যাশিত।

কিন্তু প্রত্যাশিত হলেও যুক্তিযুক্ত নয়, মঙ্গলকরও নয়। 'বাংলা দেশে' অর্থাৎ সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে ২৩ বছর ধরে যা ঘটেছিল তার খবর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এদিকে কেউই আমরা তেমন রাখিনি। ফলে আজ যখন বিস্ফোরণের মত এসে এত বড়ো ঘটনাটা আমাদের চমকে দিল তখন একদল উল্লসিত, একদল বিমর্ষ, বিভ্রান্ত। যারা উল্লসিত তারাও যে সবাই অন্তরে অন্তরে উল্লসিত তা নয়, যাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন তারাও মনে হয় ব্যাপারটাকে যথাযথ বুঝতে পারছেন না।

এই বাংলায় যে-সব মুসলমান যাঁরা আজ আশাহত ও উদভ্রান্ত বোধ করছেন, যাঁরা বলছেন মুজিবর রহমানের অসহিষ্ণুতা ও হঠকারিতা বাঙালী মুসলমানের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, যাঁরা বাঙালী উচ্ছ্বাস দেখে দ্বিগুণ সন্দিগ্ধ হয়ে 'বাংলা দেশের" এই মহান অন্দোলনকে সমর্থন করতে পারছেন না, তাঁদের কাছে আমার এই সবিনয় নিবেদন। কেন এই বাংলার মুসলমানেরও পায়ের তলার মাটি আজও কেঁপে উঠেছে তা আমি বুঝতে পারি, বুঝতে পারি কেন সর্বান্তঃকরণে তাঁরা মুজিবর রহমানের জয়যাত্রাকে আশীর্বাদ করতে পারেননি। কারণ তাঁদের একটি বড়ো আশার বাসা ভেঙে গেছে। এবং তাঁরা মনে করছেন এমনভাবে তা ভেঙে দেবার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল না।

কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের অমোঘ ইঙ্গিত যেদিকে ছিল এই বাংলার অনেক মুসলমান সেদিকে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। শুধু ধর্মের মিলটুকু মূলধন করে ভিন্ন ভাষাভাষী আর ভিন্ন সংস্কৃতিপুষ্ট ১২০০ মাইল দূরবর্তী দুটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীরা একদা একটা রাষ্ট্র গড়ে ছিলেন। এই

অভূতপূর্ব রাষ্ট্র পাকিস্তান কতদিন টিকবে তা নিয়ে তখনই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন হিতৈষী এবং বিদ্বেষীরা। ২৩ বছর পর আজ দেখা যাচ্ছে সন্দেহটা অমূলক ছিল না। কিন্তু কি করে যে এই সন্দেহটা সত্যে পরিণত হয়ে উঠল ক্রমে তার খবর কি পশ্চিম বাংলার মুসলমান রেখে ছিলেন ?

খবরটা এই। বাঙলা ভাষা, বাঙলা সংস্কৃতি এমন কি বাঙালী মুসলমানের বিদ্যাবুদ্ধি আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও গোড়া থেকেই গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানীরা। অসভ্য বাঙালীকে সুসভ্য করার জন্য উর্দু শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা—হিন্দুর স্পর্শদুষ্ট বাঙলা সংস্কৃতি ভুলিয়ে খাঁটি ইসলামী এবং উন্নত পাঞ্জাবী সংস্কৃতি দান করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু গোঁয়ার বাঙালীরা বার বার সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। তবে তার মূল্য দিতে হয়েছে বহু বীরের রক্ত ও মাতার অশ্রু। মুখের ভাষা ও হৃদয়ের সম্পদ বাঙালীর সংস্কৃতি তারা কেড়ে নিতে না পারলেও চাকরী-বাকরির সিংহভাগ দখল করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানীরা—সামরিক বিভাগেও বাঙালী মুসলমান বিশেষ পাত্তা পাননি! তাও বোধহয় বাঙালী মুসলমানের সহ্য হতো যদি বাঙালী চাষী, বাঙালীর মজুরের রক্ত জল করে অর্জন করা বৈদেশিক মুদ্রা লাহোর করাচী রাওয়ালপিণ্ডিকেই বছরের পর বছর বেশি পুষ্ট না করে চলতো। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক স্বাচ্ছল্য পূর্ব বাংলার পরিশ্রমে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বপ্রকার তাচ্ছিল্যও ঐ বাঙালীদের প্রতি। এই অসহনীয় অবস্থা পূর্ব বাঙলার মানুষকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছিল। ফলে ধর্মের ঐক্যকে দীর্ণ করে বাঙালিত্বের স্বাভিমান জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেটা উপলব্ধি করতে পারেন নি এই দিককার মুসলমানদের অনেকেই। এঁরা সংখ্যা লঘুর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী এঁদের মুসলিম স্বাজাত্যবোধকে আঁকড়ে ধরে আছেন এদিকে। ফলে এঁরা আজও 'প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙালী' থেকে গেছেন—কিন্তু ওঁরা 'প্রথমে বাঙালী ও পরে মুসলমান' হয়ে উঠেছেন। এই তফাৎটুকুর জন্যই এ বাঙলার বহু মুসলমান আজ ঐ বাঙলার মুসলমানের এই মরণপণ সংগ্রামের তাৎপর্য বুঝতে পারছেন না। একে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমর্থন করতে পারছেন না। ইতিহাসের এমনতর পরিহাস এই প্রথম নয়।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই বাঙলার মুসলমানের কাছেও ক্রমে কয়েকটা কথা পরিষ্কার হবে প্রথম ধাক্কার বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেলে। প্রথমত স্বাধীন

বাঙলার জন্য লড়াই পাকিস্তানের বুনিয়াদ গুঁড়িয়ে দিলেও এই উপমহাদেশের মুসলমানের এতে সর্বনাশ নয়, মঙ্গলই হবে। এই আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব বিপ্লব বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এই সংগ্রামের নায়ক মুজিবুর রহমান একদিন বিশ্বের ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে গণ্য হবেন কারণ শুধু পূর্ব বাংলার মুসলমানকে নয়, সারা ভারতের মুসলমানকেই তিনি এক মহত্তর পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

যাঁরা ভয় পাচ্ছেন স্বাধীন বাংলা স্বাধীন থাকবে না, ভারতের কুক্ষিগত হবে তাঁদের বিচার বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকলে এ কথা বুঝতে কষ্ট হোত না যে মুজিবুর রহমানের বাংলাকে বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে পেলে ভারতের যত লাভ একে কুক্ষিগত করে ভারতের তত লাভ নেই। স্বাধীন ও মিত্র “বাংলা দেশ” আমাদের সামরিক ব্যয় কমিয়ে দেবে কারণ পূর্ব সীমান্তে সমর-সজ্জা কম করা চলবে। বাণিজ্যেও উন্নতি হবে। চীন এবং আমাদের মাঝখানে একটি শক্ত ঘাঁটি থাকবে গণতন্ত্রের। অন্য পক্ষে স্বাধীন বাংলাকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করলে সারা পৃথিবীতে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া স্বাধীন বাংলার ভিতর থেকে তখন যে বিদ্রোহ দেখা দেবে তা দমন করতে আমাদের আথিক ও নৈতিক ক্ষতিও হবে প্রচুর। দুই বাংলা এক হবার বিরুদ্ধে দুদিকেই মানসিক প্রতিরোধ কম নয়। সে বিষয়টি বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। তবে একটা কথা সম্ভবত অনেকের কাছেই স্পষ্ট যে, দুই বাংলা এক হয়ে আবার একটি মুসলমান সংখ্যাগুরু রাজ্য হবে এই সম্ভবনাটা বহু হিন্দুর কাছেই উপাদেয় ঠেকবে না। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমান চাকরী বাকরি, রাজ্যশাসন কিংবা সংস্কৃতির চর্চার আর একবার এখনই হিন্দুর প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত বলে আমার মনে হয় না। অতএব আগ্রহটা দুদিকে মুখ্যত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও হার্দিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকে—রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের পক্ষে ততটা নয়। স্বাধীন বাংলা ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ধার ক্ষয়ে যাবে এবং দুই সম্প্রদায়েরই হৃদয়ক্ষত অনেক নিরামক হবে বলে আমার বিশ্বাস। ধর্মভিত্তিক একটি সামরিক সরকারের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ে উঠলে আধুনিক ধ্যানধারনা সম্পন্ন মানুষ তাকে প্রগতি বলেই চিনবেন আশা করি।

এই সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী করে, কারণ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এমন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অহিংস অসহযোগে প্রবৃত্ত করতে ইতিপূর্বে আর কেউ পারেননি। মনে রাখা ভালো যে, গান্ধীজীর প্রতিপক্ষ ছিল একটি সভ্য সরকার ও জাতি যার স্বদেশে গণতন্ত্রের এবং একটি উদার সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছিল। আর মুজিবুর রহমানের প্রতিপক্ষ একটি ধর্মান্ধ সামরিক শক্তি যা গণতন্ত্র বা উদার কোনো সংস্কৃতির ধার ধারে না। জনতাকে ক্ষেপিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানো সহজ, কিন্তু তাদের বুঝিয়ে একটি গঠনমূলক অসহযোগিতায় পরিকল্পনার যুক্ত করা যে তত সহজ নয় তা বার বার গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন। মুজিবুর রহমান সেই কঠিন ব্রত অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য পালন করেছিলেন এবং ভীত ক্রুদ্ধ ইয়াহিয়া খান উন্মত্তের মত এই নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে এই অহিংস অসহযোগ তিনি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারতেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। কারণ মুজিবের শক্তির উৎস বন্দুকের নলে নয়, তাঁর শক্তির উৎস আত্মনিয়ন্ত্রিত জনসাধারণের সমর্থনে, শ্রদ্ধায় আত্মদানে। শুধু মুজিবুর রহমানের নয় তাঁর অনুগামীদেরও দেখলাম জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। এই জনতা মরবার জন্য যত প্রস্তুত হয়েছিলেন মারবার জন্য তত নয়। যদি মারবার শিক্ষা আগে থেকেই নিয়ে রাখতেন তাঁরা তবে কোনো ইয়াহিয়ার ফৌজের সাধ্য ছিল না এক সপ্তাহ এই জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে মুজিবের ডাকে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এই মহত্ত্বকে অশ্রদ্ধা করতে পারে শুধু তারাই যাদের বুদ্ধি বিবেককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কোনো সংকীর্ণ শাস্ত্রবাক্য—সে আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রই হোক আর সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হোক। পৃথিবী ইতিপূর্বে কতবার এমনতর বীরত্বের পরিচয় পেয়েছে সে হিসেব ইতিহাসের পণ্ডিতরা করবেন। কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আজ যাঁরা এই বীরত্বকে শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, এই বীরত্বের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছেন না তাঁরা বড়ো হতভাগ্য। জাতীর নেতা নির্বাচনে ভুল আগেও হয়নি এমন নয়, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী যদি এই ভুল আবার করে তবে তার সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুজিবুর রহমান আজ আর একটি 'নাম' নয়, মুজিবুর রহমান আজ একটি 'ভাবনা'। এই ভাবনায় ভাবিত না হতে পারলে ইতিহাস আমাদের করুণা করবে।

প্রবন্ধটি মুসলিম ইনষ্টিট্যুট হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসভার পূর্বে লিখিত।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন

বাংলাদেশের জাতীয় আওয়ামি পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদের সংবাদ পত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিবৃতি (২০শে এপ্রিল, ১৯৭১)

শেখ মুজিবর রহমানকে আনুষ্ঠানিক প্রধান ক'রে বাংলাদেশে জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে বিতাড়িত ও উৎখাত করার জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। **আমরা দ্বিধাহীন ভাষায় একথা ঘোষণা করছি যে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারই একমাত্র আইনসম্মতভাবে গঠিত সরকার। পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জাতিগুলির কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন এই নব-গঠিত রাষ্ট্রকে সমস্তপ্রকার বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন দেন।** পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছ থেকে, বিশেষতঃ সোভিয়েত ও ভারতের গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা যে সমর্থন পেয়েছি এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য।

বিশ্বের সমস্ত মানুষের মানবতাবোধ, ও বিবেকবুদ্ধির কাছে, সমগ্র পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জাতিগুলি ও জাতিসংঘর কাছে আকুল আবেদন জানাই যে তাঁরা যেন এই নরমেধযজ্ঞ, এই হাজার হাজার নারীপুরুষ ও শিশুকে পাইকারী হত্যা বন্ধের জন্য ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

এই মুহুর্তে সর্বোপরি প্রয়োজন হোল মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি ও শক্তিগুলির একটি সম্মিলিত মোর্চা গঠন। বাংলাদেশ

সরকার ও আওয়ামি লিগের নেতৃত্বকে এ'ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করি।

দ্বিগুণ উদ্দীপনা ও দৃঢ়তা সহকারে এই সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমরা দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাই—যতদিন না জয় অর্জিত হয়। আমরা শত সহস্র শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলতে চাই যে শহীদের শোণিত স্রোত কখনই ব্যর্থ হবে না এবং জনগণ বিজয়ী হবেই। বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের দৃঢ় পদক্ষেপে এই গণহত্যা, এই নরমেধযজ্ঞের পলিসি পরাভূত হবেই। জয় আমাদেরই।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌম জনগণ দীর্ঘজীবী হোক!

পাকিস্তানী ভাই-বোনদের প্রতি

খান আবদুল গফ্‌ফর খান

আমার প্রিয় পাকিস্তানী ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি এতদিন পর্যন্ত কোন বিবৃতি দিইনি। কারণ. বিষয়টিকে সৌহার্দ্য ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাধান করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করছিলাম।

দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করেও পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে আমার আবেদনের কোনও প্রত্যুত্তর পাইনি। ইতোমধ্যে, জনসাধারণের কাছ থেকে সত্য ঘটনা গোপন এবং তাদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ভুট্টো ও কাইয়ুম বিবৃতি দান ও মিথ্যা প্রচার চালাতে ব্যস্ত ছিলেন।

কুৎসা

এটা খুবই দুঃখজনক যে সামরিক আইন থাকা সত্ত্বেও তাদের বিবৃতি সমূহ এবং ভ্রান্ত প্রচারের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য এই বিবৃতিসমূহ সংবাদপত্রে পর্যন্ত প্রকাশিত এবং বেতারে প্রচারিত হয়েছে। এই বিরোধী দলের নেতারা দেশ ও জনগণের স্বার্থে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং ঘটনার যথাযথ চিত্রকে তুলে ধরার অনুমতি পাননি। এখন সত্যের খাতিরে এবং পাকিস্তানের সমৃদ্ধির জন্য অবস্থাটাকে পরিষ্কার করে দেখানো এবং এখান থেকে যেমন দেখছি তার মূল্যায়ন করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা শুনেছি এবং যে সামরিক আইন বাঙালীর ক্ষতিসাধন করেছে ও তাদের উপর সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছে,

সেই সামরিক আইন জারীর ঘোষণা শুনেছি। আমি মর্মাহত ও দুঃখিত হয়েছি। কী এই ঘটনা, কেমন করে এটা ঘটল, এবং কেন ঘটল? বাঙালীরা খাঁটি মুসলমান। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল, কারণ, দেশবিভাগের পূর্বে একমাত্র বাঙলাদেশেই মুসলিম লীগের সরকার ছিল। সীমান্ত প্রদেশে, বালুচিস্তানে, সিন্ধুতে বা পাঞ্জাবে কোন মুসলীম লীগ সরকার ছিলনা।

পাকিস্তানের কনসাল জালালাবাদে যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন আমার মানসিক পরিস্থিতি ছিল দুঃখ ও উদ্বেগপূর্ণ। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসায় খুসী হয়েছিলাম। আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন, বাঙালীরাই পাকিস্তান ধ্বংস করছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাকিস্তান গড়ে তোলার জন্য কী চিন্তা করা হয়েছিল এবং এ কাজ কি ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বোমার সাহায্যে করা যায়?

হিংস্রতা

হিংস্রতা হল ঘৃণা এবং এটা জনগণের মধ্যেও ঘৃণা জাগ্রত করে। যদি জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা এবং অসৎ ইচ্ছা উদ্রিক্ত হয় তবে তাদের একত্রে থাকা, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং একসঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান সরকার যে পথ গ্রহণ করেছেন তা কোন গঠনাত্মক পথ নয়। কনসাল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন্‌টি গঠনাত্মক পথ। আমি তাকে বলেছিলেম, ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের পথই গঠনমূলক পথ, একই বাড়ীতে থেকে ভায়েরা যেমন পারস্পরিক উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করে তেমন পথ। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা কখনও একটি দেশকে বিভক্ত করতে চায়না; সুতরাং মুজিব সাহেব পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চাইছেন না। যদি পাকিস্তান ধ্বংস হয় তবে তা হবে কাইয়ুম এবং ভুট্টোর ভ্রান্ত নীতির জন্য।

আমি কনসালকে একথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে পাকিস্তান সরকার যথার্থ-ই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চান কি না। যদি তাই চান, তবে সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য মুজিব সাহেব ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যস্থতা করতে আমি রাজী আছি। যদি পাকিস্তান সরকার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে আমি বাঙলাদেশে যেতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে আমি আমার সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বালুচিস্তান থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে

নিয়ে গঠিত এক ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিদলকে সঙ্গে নেব। আমি এ বিষয় প্রত্যয়বান যে বাঙালীরা এই প্রতিনিধি দলকে গ্রহণ করবে। কনসাল এই প্রস্তাব রাষ্ট্রদূতকে পৌঁছে দেবেন বলে জানালেন। আমি এতে সম্মত হলাম এবং একথাও রাষ্ট্রদূতকে জানাতে বলেছিলাম যে তিনি যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করেন। কনসাল চলে গেলেন। রাষ্ট্রদূত নিজে আমায় সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন না। কিন্তু কয়েকদিন পর একজন প্রতিনিধি পাঠালেন। কনসাল তাঁর সঙ্গে এলেন এবং আমাদের আলাপ শুরু হল। আলোচনাকালে তাঁরা জানালেন যে পাকিস্তান সরকার আমাকে দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করাতে চান। আমি বলেছিলাম, বিবৃতির কোন প্রয়োজন নেই। আমার কাছ থেকে একটি বিবৃত নিয়ে কী লাভ ? যদি সরকার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকেন, তবে আমি বাংলা দেশে যেতে প্রস্তুত। তাঁরা আমাকে জিগেস করলেন, মুজিব এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন কিনা। আমি তাঁদের জানালাম, এটাই হবে আমার প্রচেষ্টা। তাঁরা জিগেস করলেন, কেন আমি পাকিস্তানে যাচ্ছিনা। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে আমি পাকিস্তানে যেতাম যদি আমি বুঝতাম যে সরকার শান্তির জন্য আগ্রহী এবং আমাকে জনসেবার সুযোগ দেবেন।

কনসাল আবার কয়েকদিন পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বল্লেন যে তিনি ইসলামাবাদে ছিলেন। আমি তাকে ইসলামাবাদের পরিস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলামাবাদে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা কি আমার পক্ষে ভাল নয় ? আমি বলেছিলাম, পাকিস্তানে সামরিক আইন বলবৎ রয়েছে এবং যুদ্ধের প্রভুরা খেলাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধ দেশের সংহতির জন্য নয়, তাহল ক্ষমতার জন্য। পাঞ্জাবের পুঁজিপতি ও সামরিক প্রভুরা নিজেদের জন্য ক্ষমতা দাবী করছে।

পুরানো খেলা

হতভাগ্য বাংলার আর কোন দোষ নেই। নির্বাচনে জয়লাভ করাই তার একমাত্র দোষ। আজ বাংলাদেশে যে খেলা চালানো হচ্ছে, পাকিস্তান গঠনের সময়ে আমাদের, পাখতুনদের সঙ্গেও তা খেলা হয়েছিলো। সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে তেত্রিশটি

আসন আমাদের ছিল। মুসলীম লীগের ছিল সতেরোটি। জিন্নাহ্ সাহেব স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলেন এবং সংখ্যালঘুদলকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান করলেন। বান্নু যাবার পথে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। তারা ইপির ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার এবং তাঁদের মতানুযায়ী যে পাঁচ লক্ষ টাকা আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলাম, সেটা ফকির সাহেবকে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন।

মিথ্যা অভিযোগ

এ অভিযোগও তাঁরা আমার বিরুদ্ধে করলেন যে আমি বলেছি পাকিস্তান হল বালির একটি দুর্গ যা একটি পদাঘাতে আমি ধ্বংস করব। দেশদ্রোহী এবং ভারতের চর বলেও তাঁরা আমাকে অভিযুক্ত করলেন। এই সমস্ত অভিযোগেই আমার বিরুদ্ধে বানানো হয়েছিলো। বাবারার অধিবাসীরা, যাঁরা শুক্রবারের নামাজ পড়ার জন্য এবং ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি মহানুভূতি জানাবার জন্য জমায়েত হচ্ছিলেন তখন তাঁদের উপর বোমাবর্ষণ করা হল এবং মেশিনগানের গুলীতে হত্যা করা হল। শত শত শিশু, নারী ও পুরুষ নিহত হলেন, লুঠতরাজ, মারপিঠ এবং অসম্মানজনক ব্যবহার শুরু হল সমগ্র প্রদেশব্যাপী। সহস্র সহস্র খোদা-ই-খিদমদ্গারকে জেলে পাঠানো হল। তাঁরা আমাদের খোদাই খিদ্মদ্গার আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন এবং আমাদের কাগজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন।

এখনও আমরা বিশ্ববাসীকে অনুসন্ধান করতে এবং এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে বলি যে কী আমাদের দোষ ছিল। আমরা একটা ছোট প্রদেশের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম, কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানকে ভাঙবার অভিযোগ বাংলাদেশর উপরে চাপানো হচ্ছে এবং বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচী পাকিস্তান সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক।

আওয়ামী লিগের দাবী

যদি ছয়দফা কর্মসূচী পাকিস্তান সংহতির পক্ষে মারাত্মক হয় তবে কেন সামরিক আইনের কর্ত্তৃপক্ষ সূচনা থেকেই এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন না? নির্বাচনের একবছর আগে থেকেই বাংলাদেশে ছয় দফার পক্ষে প্রচার চালানো হচ্ছিল এবং সেখানে এই কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করেই নির্বাচনী লড়াই চলেছিল। এছাড়া, যখন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে গিয়ে মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে মুজিবই হচ্ছেন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি। যদি ছয় দফা কর্মসূচী পাকিস্তান সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়, তবে কেন একে এত প্রসারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল?

এই কাইয়ুম কি মুজিব সাহেবের ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেন নি? বাংলাদেশে আসবার পথে করাচীতে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে বাংলা দেশের জন্য ছয়দফা কর্মসূচী সমর্থনযোগ্য, পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সঠিক নয়। এটাই পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়া এবং একটি দেশে দুটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার কাজ কি না তা নিজেরাই বিচার করুন।

ভুট্টোর ভূমিকা

ভুট্টোসাহেব ছয় দফার পাঁচটি কর্মসূচী সমর্থন করেছিলেন। ভুট্টোসাহেব এক অদ্ভুত ব্যক্তি। কখনও একথা, কখনও অন্যকথা বলেন। তিনি মুজিব সাহেবকে দুটি আইনসভার ডাকার পরামর্শের জন্য দায়ী করেন। প্রকৃত তথ্য এই যে মুজিব সাহেব সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন এবং তিনিই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। দুটি আইন সভার পরামর্শে তাঁর কী স্বার্থ ছিল? এটা ভুট্টোসাহেবেরই দাবী ছিল। তিনি চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে মুজিব সাহেবেরই প্রধান মন্ত্রী হওয়া উচিত এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোসাহেবকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। এই দাবীর অর্থ, দুটো আইনসভা থাকা দরকার, একটি পশ্চিম পাকিস্তানের, অপরটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। ভুট্টোর প্রস্তাব থেকেই দুটো আইনসভার দাবীর উৎপত্তি হয়েছে। কী করে তিনি অস্বীকার করতে পারেন যে দুটি আইন সভার দাবী তাঁর নিজস্ব নয়? বেচারা মুজিব আপোষের জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের নেতারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বলেছিলেন আমরা দেশকে দুভাগ করতে চাইনা। পাকিস্তানের আইনসভার জন্যই আমরা নির্বাচনে লড়েছি, পশ্চিম পাকিস্তানের আইনসভা বা পূর্বপাকিস্তানের আইনসভার জন্য নয়। আমরা সমগ্র পাকিস্তানের আইনসভাতেই অংশ গ্রহণ করব, কারণ পশ্চিম পাকিস্তান বলে কিছু নেই। এখানে চারটি প্রদেশ আছে।

বিশ্বাসঘাতকতা

আমি পাকিস্তানের ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণকে এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যে ধর্মের নামে পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সব সময়েই আমাদের প্রতারণা করেছে। তারা ইসলাম ও পাকিস্তানের নাম বড়াই করে বলে। যে ঘটনা আজ বাংলাদেশে ঘটছে তা কি ইসলামসম্মত এবং পাকিস্তানের জন্যই কি ঘটানো হচ্ছে ? অনুগ্রহ করে একথা মনে রাখবেন যে আমরা স্থায়ী সামরিক আইনের মধ্যে আছি।

পরিশেষে আমি পাঞ্জাবের পুঁজিপতি ও কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি, আল্লার দোহাই, তারা যেন এই দেশে ঘৃণা এবং বিভেদ সৃষ্টি না করেন। এই ভ্রান্ত এবং মিথ্যা প্রচার বন্ধ করুন। এই পথে বা শক্তি প্রয়োগ করে এই পরিস্থিতির সুরাহা হবেনা। বাংলা দেশে যুদ্ধ বন্ধ করুন। আসুন, আমরা ভাইয়ের মতো একসঙ্গে বসি এবং ভালবাসা ও হৃদ্যতার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির সমাধান করি।

শোষণ

আমার একথা মনে রাখবেন যে আমরা কোনভাবেই পাকিস্তানকে ধ্বংস হতে দেবনা। এটাও বিবেচনা করুন যে মুজিব সাহেবের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যদি সমর্থন করা না হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার, প্রদেশের অধিকার অর্জনের কী আশা থাকতে পারে ? কিভাবে তাহলে আমরা ভুট্টোসাহেবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সমর্থন করতে পারি, আমাদের নিজেদের উপর একটি ইউনিটের (Unit) কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারি ? একটি ইউনিট থেকে বহু কষ্ট আমরা ভোগ করেছি। এত বৎসর যাবৎ আমরা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-ভাবে শোষিত হয়েছি এবং আমাদের এক ইউনিটে গণতান্ত্রিক ও সেই সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও অস্বীকৃত হয়েছে।

জনগণ অনেক নির্যাতন ভোগ করেছেন, গরীব আরও গরীব এবং ধনী আরও ধনী হয়েছে। আবার আমরা এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে পারিনা এবং কোন মূল্যেই এক ইউনিটের রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে পারিনা। তোমরা যদি ভ্রাতৃরূপে আমাদের থাকতে দিতে চাও তবে আমরা আনন্দের সঙ্গেই তোমাদের ভ্রাতৃত্বকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিন্তু কোন মূল্যেই দাসত্বের কাছে অথবা আত্মসমর্পণ করব না।

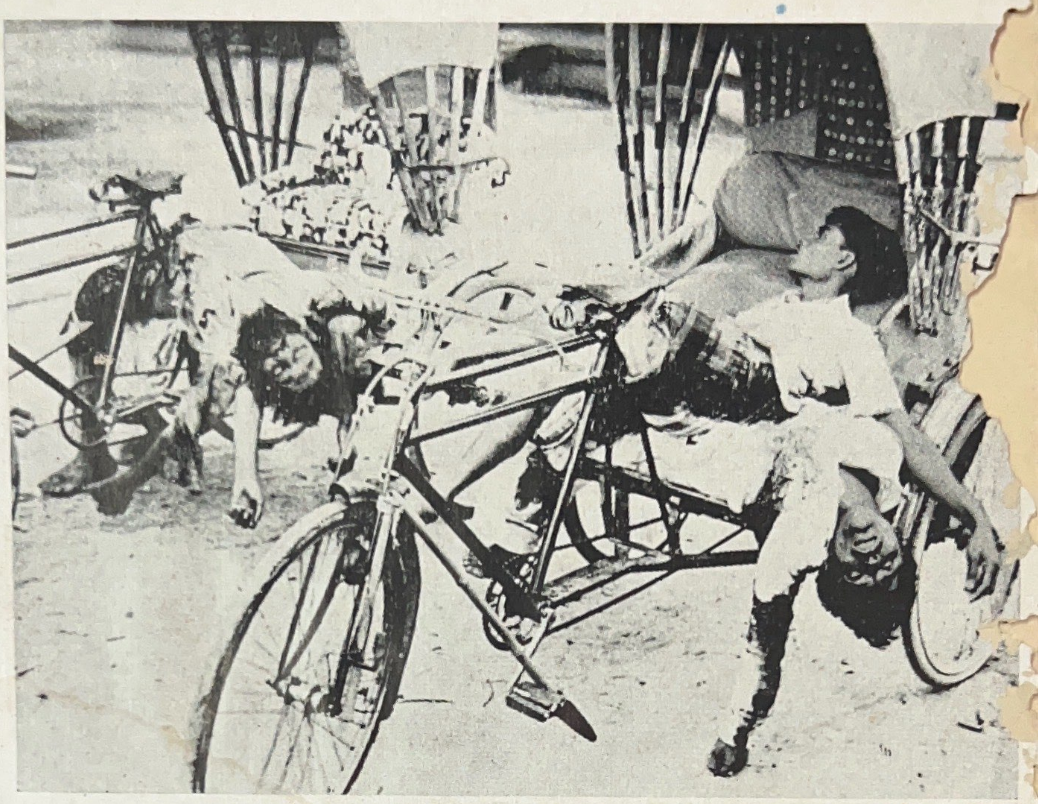

“পাকিস্তান আজ মৃত, শবের পাহাড়ের নিচে সমাহিত”…

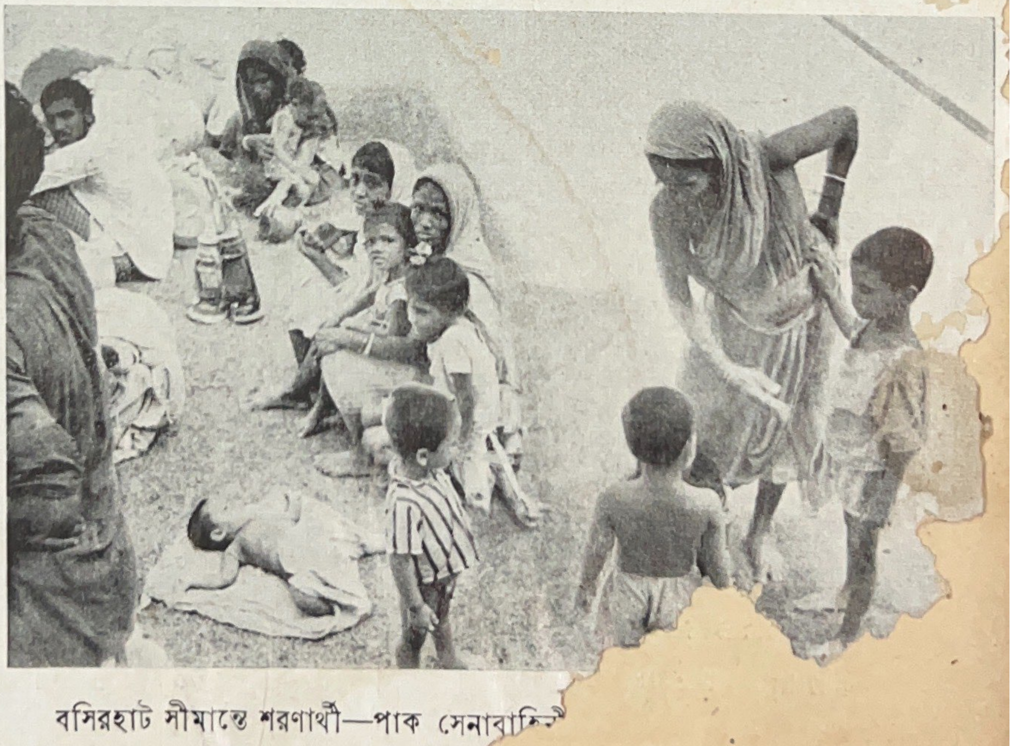

বসিরহাট সীমান্তে শরণার্থী—পাক সেনাবাহি
যেতে পারে পাকিস্তানের দুঃখজন

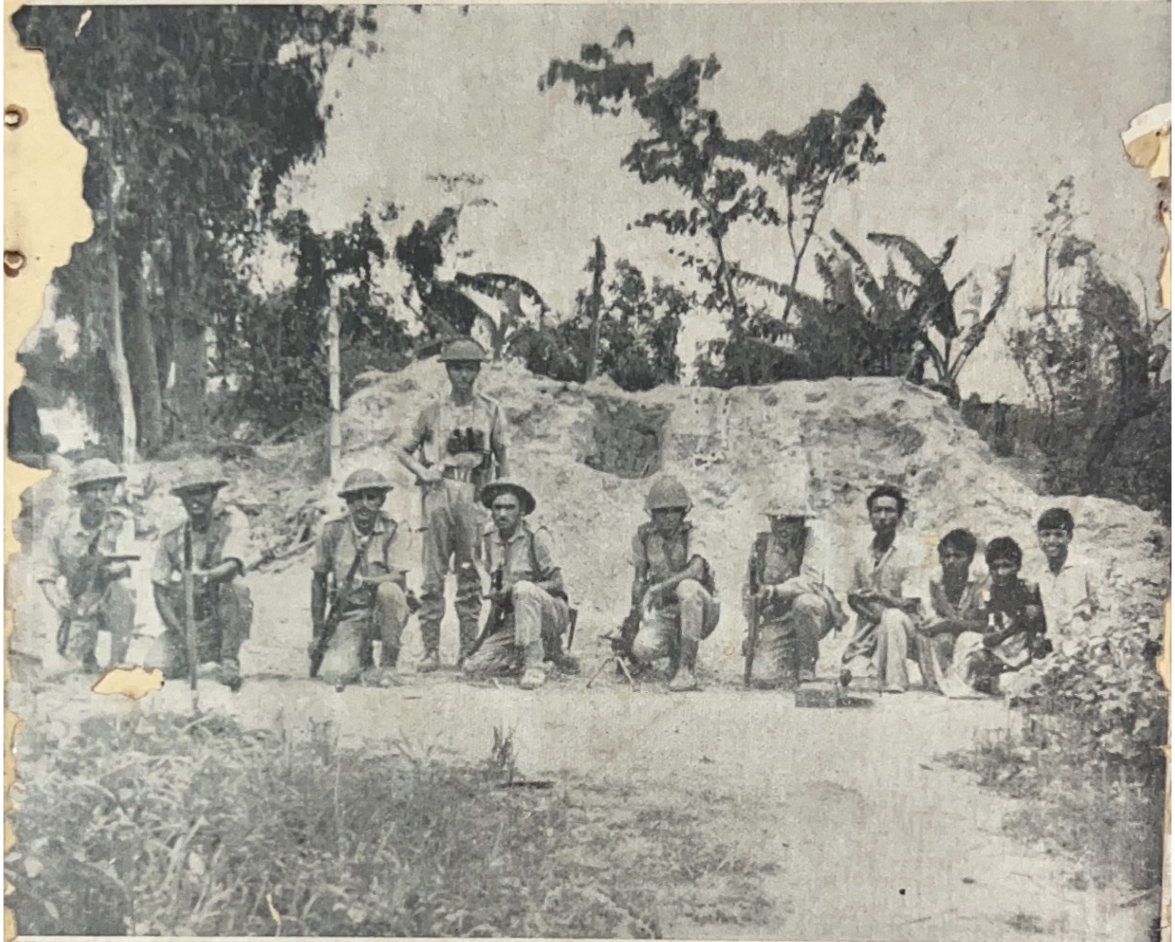

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিফৌজ—"আমরা একটা আদর্শের জন্য লড়াই করছি"…

প্রথম, দ্বি তীয় পৃষ্ঠার নিচের ও চতুর্থ পৃষ্ঠার ফোটো চিত্রাঙ্গদা পত্রিকার পক্ষে
র ছবি শ্রীমান্থ ঘোষ কর্তৃক গৃহীত।
ডিও, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২